Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৪ নভেম্বর, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৩ নভেম্বর, ২০১৪ ১৬ কার্ত্তিক, ১৪২১

আসানসোলে বিনয় কোঙারের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ অক্টোবর : কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে এক শ্রদ্ধা মিশ্রিত ধারণা আছে। বিনয় কোঙার-এর মতো মানুষদের সারা জীবনের ত্যাগ ও তিতিক্ষাই সেই ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এক সময় অন্ধ্র ও কেরলে বাসবপুন্নাইয়া, নাম্বুদ্রীপাদ-এর মতো সম্পন্ন ঘরের মানুষেরা সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে পার্টি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। বিনয় কোঙার এর পিতা শরৎ কোঙার তাঁর অধিকাংশ সম্পত্তিই মানুষের কল্যাণে দান করেছিলেন। মৃত্যুর আগে বিনয় কোঙার বাকি সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে জোনাল কমিটি পর্যন্ত পার্টির কেন্দ্রগুলিকে দান করে গেছেন। প্রতিটি সুখ-দুঃখে তিনি পাশে থাকতেন। তাঁর বক্তৃতা মানুষকে প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপিত করতো। ৬৭/৬৯ সাল থেকে বিনয় কোঙার, রামনারায়ণ গোস্বামী ও মেহবুব জাহেদী সারা জেলা জুড়ে ক্ষেতমজুরদের শ্রেণি সচেতন করার কাজ করেছেন। ২৭ অক্টোবর আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে উপছে পড়া প্রেক্ষাগৃহে প্রয়াত বিনয় কোঙার-এর স্মরণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র আয়োজিত সভায় পার্টির বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদার কথাগুলি বলেন। তিনি বলেন, আজ ৪০,০০০ কোটি টাকা খরচ করে মোদী ক্ষমতায় এসে 'আচ্ছে দিন আনে বালা হে'-এর কথা বলছেন। অথচ ১৯৮০ থেকে ১৯৯০-এ বামফ্রন্ট আমলেই পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে উন্নতির হার প্রায় ১.২২ থেকে ৬.৪৩ শতাংশ হয়েছিল। সভায় অপর বক্তা প্রয়াত নেতার স্ত্রী মহিলা নেত্রী মহারানি কোঙার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় বলেন, আমার স্বামী শুধু আমি নয়, আমার পুত্র, পুত্রবধূ কন্যাদেরও সংগ্রামে সামিল করেছিলেন বলে আমি বিশেষভাবে গর্বিত। সভায় উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, বামাপদ মুখার্জী, আভাস রায়চৌধুরী, পার্থ মুখার্জী প্রমুখ।

সাম্প্রদায়িক বিভাজনে গরিব ও শ্রমজীবী মানুষরাই বেশি আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই গরিব ও শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধ করার শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন প্রয়াত বিনয় কোঙার—এই কথাগুলি ৩১ অক্টোবর কালনার বলেন সি পি আই(এম) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সম্পাদক নৃপেন চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম কোঙার, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, রানি কোঙার, সুকান্ত কোঙার, সুধীর ঘটক।

শহরে আবার প্রতিবাদ মিছিল

সারদা কেলেঙ্কারীর ১০ কোটি টাকা কাঞ্চন উৎসবে ব্যবহৃত হওয়ার প্রতিবাদে রথতলায় এক বিশাল মিছিলে হাঁটলেন সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্ব অমল হালদার, রেজ্জাক মণ্ডল, আইনুল হক, তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, কালিশঙ্কর পাল, অচিন্ত্য মল্লিক প্রমুখ।

তৃণমূলি ছাত্রপরিষদের আরেক কীর্তি : অধ্যাপিকাকে বেধড়ক মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের ছায়া এবার বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজে। মুখ্যমন্ত্রী আই ওয়াশ করার জন্য টি এম সি পি-র সভাপতি বদল করলেও টি এম সি পি আছে টি এম সি পি তেই। আবার শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

দুই ছাত্র-ছাত্রীকে অশ্লীল অবস্থা দেখে তিরস্কার করায় অধ্যাপিকা সাত্বকি পোদ্দারকে বেধড়ক প্রহার করেন অভিযুক্ত ছাত্র। এরই প্রতিবাদে কলেজের সমস্ত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যবদ্ধ হয়ে গত ৩১ অক্টোবর অবস্থান বিক্ষোভ দেখায়। অভিযুক্ত ছাত্রকে বহিষ্কারের দাবিতে এদিন দলমত নির্বিশেষে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মচারীরা কালো ব্যাজ পড়েন। এই অবস্থানে বক্তব্য রাখেন জ্যোতির্ময় গোস্বামী, সুমন জানা, অসীম মুখার্জী, মীনা হাটি, অমরেশ প্রামাণিক।

কি ঘটনা ২৯ অক্টোবর ঘটেছিল? দু'জন ছাত্র-ছাত্রীকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে তিরস্কার করেন অধ্যাপিকা সাত্বকি পোদ্দার। এরপর তিনি চলে যান স্টাফরুমে। কিছুক্ষণ পরেই শাসকদলের এক ছাত্রনেতা অধ্যাপিকাকে বাইরে ডাকেন। বাইরে বেরোতেই ব্যাপক হুমকি এবং ধাক্কাধাক্কি করে। স্টাফরুম থেকে অন্যান্য শিক্ষকরা বেড়িয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেন। এরপর কলেজে ছুটি হলে অধ্যাপিকা বাইরে এলে রাস্তার ওপরেই বেধড়ক মারতে থাকে শাসকলদলের নেতা-ছাত্ররা। রাস্তায় এই দৃশ্য দেখে পথচলতি মানুষ হকচকিয়ে যান। রাস্তার এবং পাড়ার মানুষ ছাত্রদের মারমুখি দৃশ্য দেখে বিস্মিত হন। ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এখানেই থেমে থাকেনি অভিযুক্ত ছাত্র। টি এম সি পি'র মদতে থানাতে শিক্ষিকার নামে মিথ্যা অভিযোগ জানায়। অন্যদিকে অধ্যাপিকা ভাড়া বাড়িতে একা থাকার ভয়ে থানায় অভিযোগ জানানোর সাহস পায়নি।

৩১ অক্টোবর রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্শনের নির্দেশে কলেজের গর্ভনংবডির সদস্যা শিখা আদিত্য ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং সংসদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শহরজুড়ে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ এস পি রুদ্র। তিনি প্রশ্নের উত্তরে জানান, আগামী ৩ অক্টোবর জি বি সভা আছে। সেখানে অভিযুক্ত ছাত্রকে বহিষ্কার করা হবে কি-না তা ঠিক হবে। জানা যায় অধ্যক্ষ নিজে থেকে ঘটনার সত্যতা জানিয়ে থানায় একটি চিঠি দিয়েছেন। অভিযুক্ত ছাত্র মিথ্যা মামলায় অধ্যাপিকাকে জড়ানোর ব্যাপারে নিন্দা জানান। ছাত্র-অভিভাবকগণ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছেন। এখন দেখার, প্রশাসন এবং টি এম সি পি ঘটনাকে 'ছোট' ঘটনা বলে উড়িয়ে দেন কি-না? তবে শিক্ষাক্ষেত্রে পড়াশোনা যে শিকেয় উঠবে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বিবেকানন্দ কলেজের ঘটনা এবং শিক্ষক দিবসের দিনে রেলওয়ে বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকাকে গ্রেপ্তার করা।

কিশোরী ধর্ষিতার সঙ্গে দেখা করলেন মহিলা নেত্রীগণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ নভেম্বর : 'ধর্ষণ' এখন পুলিশের কাছে গুরুত্বহীন বিষয়। ঘটনা ঘটলেই সেই চাপা দেওয়ার চেষ্টা। ফলে ধর্ষক অপেক্ষা ধর্ষিতার ভয় বেশি, আবার যদি ধর্ষক হয় শাসকদলের। এমনই ঘটনা ঘটেছে মন্তেশ্বর থানার কাটশিহি গ্রামের। ২৪ অক্টোবর মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী আদিবাসী কিশোরীকে ধর্ষণ করে মন্তেশ্বর কলেজের টি এম সি পি নেতা সোমনাথ হাজরা। পাশবিক অত্যাচারে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিশোরী। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে তাকে ভর্তি করা হয়।

৩১ অক্টোবর ধর্ষিতা আদিবাসী কিশোরীকে দেখতে হাসপাতালে আসেন জেলার মহিলা প্রতিনিধিদল। দলের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন কিশোরীর মা। তাঁদের কাছে জানতে চান আমার মেয়ে কি পড়তে পারবে না? আদিবাসী বলে আমাদের মেয়েরা কি উচ্চ-শিক্ষিতা হবে না? শাসকদলের গুণ্ডারা হিংস্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অভিযুক্তের কঠিন শাস্তি চাই। পুলিশ সেভাবে ভূমিকা নিচ্ছে না। আমরা বাস করবো কী করে? ধর্ষকের কঠোর শাস্তি চাই। প্রতিনিধিদল আশ্বাস দেন তাঁদের পাশে থাকার এবং তাঁরাও অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জী, শান্তি পাল, অরুন্ধতি সেন, মিতা কাঞ্জিলাল, সুমিত্রা কোঙার, রূপা কোঙার ও পারুল ঘোষ প্রমুখ।

'নতুন চিঠি'র শারদ মিলন ২০১৪

স্থান : জাগরী, গুডশেডরোড, বর্ধমান

সময় : ৮ নভেম্বর, শনিবার, বিকাল ৫ টা

সবান্ধবে আসুন

—নতুন চিঠি পরিবার

আবার কিশোরী ধর্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ নভেম্বর : শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হলে ধর্ষণ করা অন্যায় নয়। এই তত্ত্বই চলছে সারা রাজ্য জুড়ে। মা-মাটি-মানুষের পুলিশ শাসকদলের ধর্ষকদের আড়াল করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২৯ অক্টোবর রায়না রূপসোনা গ্রামে ৭ বছরের এক কিশোরী ও রেহাই পেল না তৃণমূলি কর্মীর হাত থেকে। বেশ কয়েকদিন তার ওপর অত্যাচার চলে, ভয়ে বলেনি বাড়িতে। অভিযুক্ত জাহাঙ্গীর সেখ(৪৫) প্রতিবেশি। বেশ কয়েকদিন অত্যাচারের পর অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িতে বলে ঘটনার কথা। জানাজানি হলে গ্রামের মানুষ জাহাঙ্গীর সেখকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। পুলিশ প্রথমে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও মানুষের চাপে ধরতে বাধ্য হয়। এলাকার মহিলা সমিতি এবং সাধারণ মানুষ দোষীর কঠোর শাস্তি এবং ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে। কিশোরীর বাবা থানায় অভিযোগ করার পর অভিযুক্তকে পুলিশ জেল হেফাজতে নিয়েছে।

খাগড়াগড় এবং ...

দেবেশ ঠাকুর

অষ্টমীতে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বোমা ফাটলো। তারপরই বিপুলভাবে মানচিত্রে বর্ধমান উঠে এলো। বহুদিন পর আবার এক নরওয়েজিয়ান বন্ধু অসলো থেকে ফোন করে বলল, আর ইউ ওকে? বোমার স্প্লিন্টার ছড়িয়েছিলো খাগড়াগড়ের একটি বাড়ির দোতলায়। তার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বজুড়ে। বিশ্বের সন্ত্রাস-মানচিত্রে বর্ধমান নিয়ে চর্চা চলতে থাকলো। এ বর্ধমান আমার অচেনা। কেন এমন হল? উত্তর দিতে পারতেন আমার অন্যতম নাট্যগুরু আবদুল মজিদ। তিনিও কয়েক বছর আগে বিদায় নিয়েছেন। আবার বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের একশো মিটারের মধ্যে আছে খক্কর শাহ্-এর মাজার। লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ-এর মন্দিরের দেড়শো হাতের মধ্যে পীর বাহারাম সাক্কার মাজার। সাক্কা মানে জলদানকারী। তৃষ্ণার্ত পথিকের তৃষ্ণা নিবারণ করতেন এই মানবদরদী। খক্কর শাহ্-র আত্মজন ছিলেন যোগী জয়পাল। আমার বর্ধমানের কুলবধূ মেহেরবিবি যেমন করে দিল্লি গিয়ে নুরজাহান হয়ে পর হয়ে গেল, বর্ধমান কি আমার হৃদি-মানচিত্র থেকে পর হয়ে যাবে?

খাগড়া-কাণ্ডের দু'দিন পর আমার সহকর্মী বন্ধু হাসান ফোন করেছিলো, এ কী হ'ল! এক বিস্ফোরণে যে বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দিয়ে গেল!

ট্রেনে বাসে ফিসফাস। চায়ের দোকানে ফিসফাস। অফিস-আদালতে ফিসফাস। চেনা মানুষ। আরবি-ফার্সি নাম। হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফাস বন্ধ হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি একটু বেঁকে গেল। চেনা হাতটা জড়িয়ে ধরে হাতটা শুঁকে নিল কেউ কেউ। বারুদের গন্ধ লেগে আছে কি? বারুদ না থাক অবিশ্বাসের গন্ধ। গন্ধটা হাতে থাকতে থাকতেই কারও কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো, এই জন্যই মোদিকে দরকার।

আসলে অনেকে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে এক বন্ধনীতে রাখতে গিয়ে খানিকটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

কতকগুলি প্রাথমিক ধারণা নিয়ে চর্চা করা যাক। প্রথম কথা হল সাম্প্রদায়িকতার মানে কী? আমার অনুভব হল, যারা নিজের সম্প্রদায় (সে ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বা সামাজিক জনগোষ্ঠী হতে পারে) সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট, তাকে সাম্প্রদায়িক বলা যেতে পারে। ধার্মিক এবং সাম্প্রদায়িক এক নয়। ধার্মিক স্বধর্মে বিশ্বাস করে। সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস করুক না করুক আরোপের প্রয়াস করে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম জিনিসটি একান্ত ব্যক্তিগত। পারিবারিকও নয়, সামাজিকও নয়। সম্প্রদায় কিন্তু সামাজিক। তার চর্চা সমষ্টিগত। ধর্মের বিপরীত শব্দ কিন্তু অধর্ম নয়। ধর্ম এবং বিশ্বাস প্রায় সমার্থক। অবিশ্বাস মানে প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা। যতক্ষণ সেই 'অবিশ্বাসী' প্রশ্নের উত্তর পায় না, ততক্ষণ সে প্রশ্ন করে যায়। তারপর সে আবিষ্কার করে। বিশ্বাসী প্রশ্ন করে না। তার ধর্ম বা শাস্ত্র তাকে যা বলে তাই মেনে নেয়। না-মানা বা অবিশ্বাস ধর্মের অভিধানে থাকতে নেই। যে ধর্ম যত প্রাচীন, তার অনুশাসন তত শ্লথ। যে ধর্ম যত নবীন তার নির্দেশনামা তত দৃঢ়, সুসংবদ্ধ এবং সামষ্টিক। যে বুদ্ধদেব বলছেন 'আত্মদীপ ভবো', তাঁর অনুগামীরা বলছেন 'সংঘং শরণং গচ্ছামি'। আত্ম এবং সংঘ কখনোই এক নয়। বিশ্বাস আত্মগত, সংঘ-গত নয়। এর পরেই প্রশ্ন আসে, যে বিশ্বাস করে মুল-এ, তিনি কি মৌলবাদী? ধর্ম এবং তার অনুশাসন বা শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখলেই কি মৌলবাদী বলা যাবে? বলা যেতেই পারে। তার জন্য রাগ-রোষ করার প্রয়োজন নেই। মূল-এ বিশ্বাস রেখে জীবনযাপনে অসুবিধা কোথায়! কোনো অসুবিধা নেই পুজোয়-নামাজে। অসুবিধা আরোপে। তখনই আসে বিভাজন। এই বিভাজনকে রামকৃষ্ণ অতি সহজ কথায় বলেছেন, এ মতুয়ার বুদ্ধি। আমারটা ভালো বলার অধিকার সবধর্মেরই আছে। ভালো বোঝেন বলেই অনুগামী। কিন্তু অন্যেরটা মন্দ একথা বলার অধিকার আমার নেই। আমার বিশ্বাসের ভালমন্দ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারও নেই।

আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। সেকুলার। সেকুলার শব্দটি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যে যার মতো ব্যাখ্যা করে প্রয়োগ করেছেন। সব ধর্মে সসম্মান বিশ্বাস কি সেকুলারইজম, না কি কোন ধর্মেই বিশ্বাস না রাখা অথবা পরধর্ম সহিষ্ণুতা—কোনটি প্রকৃত সেকুলারইজম! সব ধর্মে সমান আস্থা রাখা যায় না। এ অসম্ভব। হিন্দুধর্ম (সনাতন ধর্ম) আকারবাদী। খ্রিস্টধর্ম-ইসলাম

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৩ নভেম্বর, ২০১৪

কলুষিত শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে তৃণমূলি দুর্বৃত্তায়ন কোন পর্যায়ে গেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিবেকানন্দ কলেজের পর পর দু'টি ঘটনা আর একবার তার প্রমাণ দিল। আরাবুলকে দল থেকে সাসপেন্ড করা যে একটি রাজনৈতিক চমক মাত্র এবং আরাবুলবাদই যে আগামী দিনেও শিক্ষাঙ্গনে দাপিয়ে বেড়াবে এই দুই ঘটনায় তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিললো।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যথেচ্ছাচার চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অপরাধে বামপন্থী শিক্ষাকর্মীদের ব্যাপক বদলির নির্দেশ কেন সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা হলোনা, এই অভিযোগে বিজ্ঞান বিভাগের সচিব শুভাপ্রসাদ নন্দী মজুমদারকে বাইরের গুণ্ডাবাহিনী এনে লাঞ্ছিত করে তৃণমূল কর্মীসংগঠনের এক নেতা। শুভপ্রসাদবাবুর সাহসিকতা এবং দলমত নির্বিশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা এগিয়ে আসায় তিনি বড় ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। এর আগে তিনি নিজের বাসস্থানেও আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্বারা। এর বিরুদ্ধে কর্মীরা উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে উপাচার্য ঘরে একা বসে থাকা সত্ত্বেও সেই ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করেন। আর একবার তিনি প্রমাণ করলেন, তাঁর মদতেই এসব কাণ্ড ঘটছে। তবে লক্ষণীয়, তৃণমূলের সমর্থক কর্মীদের একটি বড় অংশই এ ধরনের কার্যকলাপকে আর সমর্থন করতে চাইছেন না।

বর্ধমান বিবেকানন্দ কলেজেও একজন অধ্যাপিকাকে যে কারণে এবং যেভাবে কলেজে ও কলেজের বাইরেও তৃণমূলি 'ছাত্র' নামধারী দুষ্কৃতীদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তাতে যে-কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষেরই লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাবে। তৃণমূল ছাত্রনেতাদের প্রশ্রয়ে ফাঁকা শ্রেণিকক্ষকে এক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীর কুরুচিকর আচরণের আস্তানা বানিয়ে ফেলার ঘটনা এখন প্রায় সব কলেজেই কম-বেশি ঘটতে শুরু করেছে। এরকম একটি ঘটনার জন্য তিরস্কার করার অপরাধেই তৃণমূল ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের হাতে এই অধ্যাপিকাকে শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত হতে হয়। তবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যেভাবে কলেজের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এক হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং বৃহত্তর শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজ যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, এমনকী এগিয়ে এসেছে মহিলা কমিশনও, তাতে প্রমাণ হয় তৃণমূলি এই নৈরাজ্য ক্রমশই মানুষের কাছে দুঃসহ থেকে দুঃসহতর হয়ে উঠছে।

বর্তমানে তাই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনকে এইভাবে কলুষিত করার বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রতিবাদ সংগঠিত করার বাস্তব ভিত্তিও ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। শুধু শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িতরাই নয়, যাঁদের ঘরের ছেলে-মেয়েরা এইসব শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থী, তাঁদেরও প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠা একান্ত জরুরি। নইলে তৃণমূলি অপসংস্কৃতি ও দাঙ্গাবাজী আগামী প্রজন্মেরই সর্বনাশ সাধন করবে। পশ্চিমবঙ্গ হারাবে তার সম্মান ও গৌরব—তিন বছরের তৃণমূল শাসনে ইতোমধ্যেই যা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তুঘলকি কাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের সেক্রেটারি (বিজ্ঞান) ও সুপরিচিত শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদারকে হুমকি-ভীতিপ্রদর্শনের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল সমর্থক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আচমকা এক নির্দেশে একশ কর্মচারিকে বিভিন্ন বিভাগে স্থানান্তরের নির্দেশ জারি করেন। ওই নির্দেশ বলে কয়েকজন কর্মচারির 'বিকল্প' না থাকায় সমস্যা অনুভব করেন শুভপ্রসাদবাবু। তিনি, রেজিস্ট্রার শ্রীপতি মুখার্জী এবং উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকারকে এ সমস্যার কথা জানান। আলোচনায় বসাও হয়। অভিযোগ, এরপরই তৃণমূল সমর্থিত শিক্ষাবন্ধু সমিতির সম্পাদক সীতারাম মুখার্জী টেলিফোনে তাকে হুমকি দেন। অশানীল শব্দ-প্রয়োগ করেন। অভিযোগ, এরপরে প্রায় ৭০ জনের একটি দল (যাদের মধ্যে বহিরাগতরাও ছিলো) তার দপ্তরে চড়াও হয়। তাকে আটকে রেখে হুমকি, ভয় দেখানো ও গালিগালাজ চলতে থাকে। এ সময় কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মচারি ও ছাত্ররা এসে তাঁকে রক্ষা করেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট দিবস কবে পালিত হয়?
২. প্রখ্যাত ইংরেজ কবি জন কিটস কবে জন্মান? মৃত্যু কবে হয়েছিল?
৩. ভগিনী নিবেদিতার আসল নাম কী ছিল? কোথায় জন্ম এবং কবে জন্ম? মৃত্যু কোথায়, কবে?
৪. শিক্ষাবিদ্ ও কৃষি বিশেষজ্ঞ গিরিশচন্দ্র বসুর কোথায় কবে জন্ম? মৃত্যু কবে?
৫. বি সি জি টিকা আবিষ্কার কে করেন? আর কে এ কাজে যুক্ত ছিলেন? এঁর মৃত্যু কবে?
৬. বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন কবে গঠিত হয়? কোথায় এই সম্মেলন হয়? কটা দেশের কতজন প্রতিনিধি, এই সম্মেলনে যোগ দেন?
৭. প্রখ্যাত রুশ কবি ও লেখক ফিয়দোর মিখাইল ডস্টভস্কি কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
৮. আবোল তাবোল-এর স্রষ্টা সাহিত্যিক সুকুমার রায় কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
৯. চীন দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব চিয়াং কাইশেক কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
১০. ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধি কবে কার দ্বারা নিহত হন?
১১. কবে প্যালেস্টাইন ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্র হয়?
১২. ভারতের শাসনভার রানি ভিক্টোরিয়া কবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে গ্রহণ করেন? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই

সুনামী গুপ্ত

বেশ কয়েকবছর আগের কথা। বর্ধমান রাজ কলেজে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনার শিরোনামটি ঠিক মনে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং মুক্তচিন্তার বার্তা এই আলোচনায় বার বার যে বিশ্লেষিত হয়েছিল, সে কথা এখনও মনে আছে। মুখ্য আলোচক ছিলেন বিশ্বভারতীর যশস্বী অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রচর্চার অন্যতম গবেষক লেখক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর মনোজ্ঞ, অনবদ্য ভাষণ সেদিন শ্রোতাদের মনন-চিন্তনে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, তাতে এই প্রতিবেদক সহ অনেকেই সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'আমি কোনও ধর্মের ঘেরাটোপে নিজেকে সীমাবদ্ধ বা চিহ্নিত করতে চাই না। কারণ এই চিহ্নিতকরণ আমাকে অপরাপর ধর্মাবলম্বী মানুষ এমন কি সাধারণ মানুষ থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এই পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসেবেই আমার জন্ম। আর মানুষ এই পরিচয়েই আমি পরিচিত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। অন্য পরিচয় আমার জীবনে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক।'

কিন্তু, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাস্তবতায় বিভিন্ন ধর্মের ছত্রছায়ায় বেশির ভাগ মানুষ লালিত হয়েছেন এবং নিজ-নিজ ধর্মের উপদেশ, অনুশাসন ও আনুষ্ঠানিক কৃত্যাদি তাঁরা পালন করে থাকেন। ধর্ম-দর্শনের মৌলিক প্রস্তাবনায় অনেক সুন্দর-সুন্দর কথাও আছে। অশান্তি নয়, হিংসা নয়, সংকীর্ণতা নয়, সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ভালোবাসা সম্প্রীতির আবেদনও রয়েছে। এই সকল ধর্মের প্রবর্তক, দার্শনিক যাঁরা বিভিন্ন যুগে মানুষে মানুষে মিলনের কথা বলেছেন, তাঁরা ধর্মের মাধ্যমেই (ধৃ + মন্, অর্থাৎ যা ধারণ করে রাখে) সমাজ সংস্থিতির বার্তা তুলে ধরেছেন। কিন্তু ধর্মদর্শন আর তার ফলিত রূপ একরকম নয়। তার ফলেই অনুসারক যাজক, পাণ্ডা, পুরোহিত, মোল্লারা নিজ-নিজ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় ভয়ঙ্কর, সংঘর্ষকামী, বিভেদপন্থী কার্যকলাপের জন্য উন্মাদনা সৃষ্টি করেছেন। এখন পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, অত্যাচারের মাত্রা যত বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষে মানুষে বিভাজনের জন্য বীভৎস ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের তাণ্ডব। এই মদোন্মত্ত ফ্যাসিস্টরা নানা কায়দায় ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সাধারণ মানুষকে বিভাজিত করে সুস্থ, শুভবুদ্ধির চিন্তাকে শুধু ক্ষতবিক্ষত করছেই না, শিশুঘাতী নারীঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশের জনজীবনকে বিধ্বস্ত করছে। যুগ-যুগান্তর ধরে বিশ্বের নানা প্রান্তের মনীষীরা এদের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়েছেন, পথে নেমেছেন, এমনকি জীবনাহুতিও দিয়েছেন। তবু এই ভয়াল, সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদের সামন্তবাদের উপজাত এই ধর্মীয় ফ্যাসিস্টরা বার বার মানুষের সভ্যতার সংকট এবং দুঃসময় ডেকে এনেছে। সম্প্রীতি, শুভ কামনায় মানুষকে এক করার বাসনা থাকলেও বাস্তবে শোষিত, বঞ্চিত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য এখন গভীরভাবে বিপন্ন।

বিবেকানন্দ কথিত 'ধর্মপিশাচ'রা এখন অতিমাত্রায় সক্রিয়। রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মপ্রচার', 'ধর্মমোহ', 'বুদ্ধভক্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি কবিতা, মুসলমানীর গল্প, গোরা উপন্যাস, চতুরঙ্গ উপান্যাসের জ্যাঠামশাই চরিত্রের মানবিক আবেদন যাই হোক না কেন, অনেক 'সাচ্চা' রবীন্দ্রভক্তরাও তার মর্মার্থ নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করেন না। বরং ধর্মপিশাচদের কার্যকলাপ এবং কদর্য হিংস্র প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অবিশ্বাস, সংশয় এবং ঘৃণার ক্লেদে নিজেদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনছেন। হাসিম সেখ এবং রামা কৈবর্তের একই যন্ত্রণা, কান্নার কথা কে উপলব্ধি করবেন? হিন্দুপ্রধান ছোট গ্রাম কাশীপুরের মুসলমান প্রজা গফুর আর তার মেয়ে আমিনাকে কেন ঘর ছেড়ে ফুলবেড়ের চটকলে চলে যেতে হয়েছিল, 'মহেশ' গল্পের সেই কালোত্তীর্ণ সংবেদনশীলতা কি হারিয়ে যাবে? শ্রীকান্তের বন্ধু গহরের মানবিক জীবন কাহিনিকে মরমী পাঠক কি মনে রাখবেন না?

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কালজয়ী সাহিত্য-সংস্কৃতির বার্তা হয়তো বুভুক্ষু জীবনযন্ত্রণায় অস্থির শোষিত মানুষের কাছে পৌঁছায় নি। কিন্তু যেসব মতলববাজ আজ নানা ফিকিরে এইসব মানুষকে, তাদের মগজগুলোকে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করছে, তাদের মুখোশ খুলতেই হবে। মহাকালের ভ্রূকুটি উপক্ষো করে আজও কবি চণ্ডীদাসের সেই অমর চরণদুটি আমাদের আন্দোলিত করে—

'শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'

আবার 'জাতির পাঁতি' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু, সে জাতির নাম মানবজাতি/একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত, একই রবিশশী মোদের সাথী।' কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' ও 'জাতের নামে বজ্জাতি' কবিতায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়েছে।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশ-বিদেশের মানবমুক্তির সংগ্রামে যাঁরা অধিনায়ক ছিলেন, তাঁরা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সকল বঞ্চিত মানুষকে এক করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে রাজশক্তি, শোষকশ্রেণিগুলি এইসব বঞ্চিত মানুষকে বিভক্ত করার যে অশুভ খেলায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে লালন করেছিল, তার ফলেই অতীতে বহুবার, এখনও বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেই চলেছে। '১৯৪৬-৪৭' নামক বিখ্যাত কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ তৎকালীন দাঙ্গায় যারা নিহত হয়েছিল, তাদের কথা লিখতে গিয়ে 'হানিফ মহম্মদ', 'করিম', 'মকবুল', 'আজিজ' এই নামের কয়েকজন মুসলমান এবং 'গগন', 'শশী', 'বিপিন' এই নামের কয়েকজন হিন্দুর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এইসব মানুষগুলি সমাজের ওপরতলার লোক ছিল না। 'ছেঁড়া-জুতো পায়ে দিয়ে', 'বাজারের পোকা-কাটা জিনিসের দরদাম করে', এই সব প্রাণকণা বেঁচেছিল। সাধারণ গরিব-গুর্বো মানুষ, মেহনতি জনগণই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার, লুটপাট, নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বড়ো শিকার। আজ হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদী ফ্যাসিস্টরা আর ইসলামিক মৌলবাদী ফ্যাসিস্টরা যখন খুব হিসেব কষেই গোটা দেশে উন্মাদনা তৈরি করছে, তখন অনিবার্য ভাবে মনুষ্যত্বই বিপন্ন হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষিতে যথার্থ সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, বামপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকেই রাস্তায় নামতে হবে। 'এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।' সেই আলো জ্বালাবার জন্যে সম্প্রীতির মিছিল ক্রমশ দীর্ঘতর হয়ে উঠুক।

যদি আসে কোন দিন সেই কালো টাকা

তপোময় ঘোষ

কালো টাকা উদ্ধার করে এদেশে ফিরিয়ে আনার বেশ তোড়জোর চলছে বটে। শীর্ষ আদালত, কেন্দ্রীয় সরকার সংবাদমাধ্যম এবং আইনজীবীরা মিলে এমন অবস্থা তৈরি করেছেন, যাতে আমাদের আশা না জেগে উপায় নেই। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনে হতে শুরু করেছে, এই বুঝি কালো টাকা গুলো সাগরপার থেকে এলো এবং দেশের উন্নতির কাজে লেগে গেল! আর দেরি নেই।

আশাটা জাগবেই না বা কেন? মোদির মতো একজন বলিয়ে-কইয়ে-করিয়ে নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি স্বয়ং ওইসব কালো টাকা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। মোদিজি কথার সঙ্গে কাজের মানুষ। সেই কাজ শুরু হয়েছে।

ভুল হল। কালো টাকা উদ্ধারের কাজ, এইমাত্র, মোদির আমলে শুরু হয়নি। বহু আগে শুরু হয়েছে। ২০০৯ সালেই আইনজীবী রাম জেঠমালানি সহ আরও পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। ২০১২ সালে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর উদ্যোগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি শ্বেতপত্রও প্রকাশিত হয়। জানি না, এবার সত্যিকারের কাজ হবে কি-না। তবে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা বলছেন হবে না! কেন? তাঁর যুক্তিও তারা দিচ্ছেন।

এদেশের কালো টাকার বিশেষজ্ঞ, গবেষক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরুণ কুমার সেই ১৯৭৩ সাল থেকে এ বিষয়ে শুধু গবেষণাই করছেন না, গবেষণার পদ্ধতিপ্রকরণও উদ্ভাবন করছেন, তিনি বলছেন 'অত সহজে নয়।'

কেন অত সহজে নয়? গত ২৭ জুনের 'ফ্রন্টলাইন' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ''কালো অর্থনীতির

বৈশিষ্ট্য হল তা মূলধনের অপচয়। আমি তাকে গর্ত খুঁড়ে বোজানোর মতো বলি। আপনি দিনের বেলায় একজন মানুষকে দিয়ে গর্ত খোঁড়ালেন এবং রাত্রে আরেকজন মানুষকে নিয়োগ করে সেটা বোজালেন। এটা উৎপাদনবিহীন একটা কাজ কারবার। এতে মূলধন পুঁজি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কিছু আউটপুট পাওয়া যায় না। কারণ এই কালো অর্থনীতির বেশিরভাগটাই বে-আইনি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট। এই অর্থনীতির একটা আউটপুটও আছে। কিন্তু অপচয়ের জন্য তা কার্যকর হয় না। ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার এখন ১২ শতাংশ। এটা কালো অর্থনীতির অ-কল্যাণেই। নইলে প্রকৃত বৃদ্ধির হার মাত্র ৭ শতাংশ। ১৯৭০ সালে প্রকৃত বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৫ শতাংশ তখনও তা ফাঁপিয়ে দেখিয়েছিল ৮.৫ শতাংশ।''

—এরপর তিনের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

ঋতু পরিবর্তনে রোগ-বালাই

ডাঃ গৌতম সাহা

ঋতু পরিবর্তনের সময় যে সকল শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রোগীরা হাসপাতাল ও ক্লিনিকে হাজির হন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি ইত্যাদির সমস্যা। এই সময়ে পরিবেশে ভাইরাসের উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই সন্ধিক্ষণে তারা অতি মাত্রায় সক্রিয়ও হয়ে ওঠে। ফলে, 'ভাইরাল ফিভার' নামক সাধারণ সর্দি-জ্বর-এর প্রকোপে শিশু সহ প্রায় সকলেই কম-বেশি আক্রান্ত হন।

আর যে যে রোগগুলো এই সময় বেশি পরিলক্ষিত হয় তারা হল—

(১) অ্যালার্জিক রাইনাইটিস—নাকের সমস্যা

(২) কনজাংটিভাইটিস—চোখের অসুখ

(৩) অ্যাকিউট ফ্যারিনজাইটিস—গলার ভেতরের শ্লেষ্মা ঝিল্লির প্রদাহ

(৪) অ্যাকিউট ফ্যারিনগো টনসিলাইটিস—হঠাৎ করে একই সঙ্গে গলবিল ও টনসিলের প্রদাহ।

উপসর্গ : গলায় ব্যাথা, জ্বর, কাশি ইত্যাদি।

ঈষদুষ্ণ জলে নুন দিয়ে দু'বেলা গার্গল করলে আরাম হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা-ই চিকিৎসা।

(৫) ব্রঙ্কাইটিস—সংক্রমণ গলা ছাড়িয়ে বুকের দিকে নামতে থাকে এবং কাশি, বুকে-ব্যথা, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে উপস্থিত হয়।

(৬) অ্যাকিউট ল্যারিনজাইটিস— গলার স্বর বসে যায়। থাকে 'স্বরভঙ্গ' বলে। স্বরের বিশ্রাম (Voice Rest) ও গরম তাপ (Steam inhalation) নিলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় হয়।

(৭) নিউমোনিয়া বা নিউমোনাইটিস—ফুসফুসের প্রদাহ।

(৮) হাঁপানি বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা-র তীব্রতা বৃদ্ধি।

(৯) কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাইরাল গ্যাস্ট্রোএনটেরাইটিস—ইত্যাদি।

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই বিভিন্ন উপসর্গে ভুগলেও এই সময়টাতে বেশি কষ্ট পায় শিশুরা। যেহেতু তাদের দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বড়দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম; তাই অল্প সংক্রমণেও তারা কাহিল হয়ে পড়ে। সর্দি, হাঁচি, নাক দিয়ে জল-পড়া, মাথায় ব্যথা, গা-হাতে-পায়ে যন্ত্রণা, জ্বর, কানে ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ ও লক্ষণ নিয়ে ওরা উপস্থিত হয় হাসপাতালের শিশু-বহির্বিভাগে বা শিশু-বিশেষজ্ঞের ক্লিনিকে।

নবজাতক থেকে শুরু করে এক বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের কষ্ট স্বভাবতই বেশি। বেশির ভাগ অসুস্থ শিশুকে বাড়িতে রেখে ওষুধ-পথ্য দিয়ে সুস্থ করে তোলা গেলেও কাউকে-কাউকে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয়। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে যারা ভর্তি হয় তাদেরকে শিরার মধ্য দিয়ে বিশেষ তরল ওষুধ-পথ্য, সংক্রমণ (ব্যাকটেরিয়াল) সামাল দেবার জন্য উপযুক্ত জীবাণুনাশক বা অ্যান্টিবায়োটিক, শ্বাসকষ্ট কমাবার ওষুধ—ব্রঙ্কোডাইলেটর, প্রয়োজন হলে নেবুলাইজারের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণ ওয়ার্ডে রেখে বেশিরভাগ শিশুরই চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করতে অবশ্যই আই সি ইউ-তে ভর্তি করে নিতে হয়।

অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হল এক ধরনের অ্যালার্জিঘটিত নাকের অসুখ। (Rhinos মানে নাক।) পরিবেশের তাপমাত্রার তারতম্য, ধোঁয়া, ধুলো, ফুলের পরাগরেণু, ধূপের ধোঁয়া ও গন্ধ, সেন্ট বা পারফিউম, বডি ডিওডোরেন্ট, রান্নাঘরের মশলা ফোড়নের ঝাঁজ ইত্যাদির প্রভাবে ক্রমাগত হাঁচি, নাক দিয়ে জল গড়ানো, চোখ-মুখ-নাক লাল হয়ে যাওয়া, অল্প-অল্প জ্বর থেকে শুরু করে 'ভালোমত' জ্বর হওয়া, সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা প্রভৃতি মাঝারি মাপের (moderate) অসুস্থতায় ভোগেন রোগীরা।

হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক এবং আরও বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর নিরাময় করা হয়ে থাকে। তবে বিশ্রাম, বেশি পরিমাণে তরল খাবার, পানীয় গ্রহণ, পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশ করে এ'রকম স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগীকে রাখতে হবে। তিন থেকে পাঁচ দিন বড়জোর সাত দিনেই অধিকাংশ পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যান। যদিও অনেকে PostéôéViral Asthenia নামক syndrome-এ ভোগেন। এতে রোগী খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। সারাক্ষণ খালি ঘুম-ঘুম পায় এবং খিদে কমে যায়। এই পর্যায় মাত্র তিন থেকে পাঁচ দিন থাকে। পুষ্টিকর খাবার, পানীয়, বিশ্রাম, ভিটামিন, খনিজ লবন (Mineral) ইত্যাদি পরিপূরকের সাহায্যে অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়।

অধিকাংশ ভুক্তভোগী মাত্র ক'দিনেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেলেও খুব কম কয়েক শতাংশের ক্ষেত্রে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে গিয়ে থাকতে পারে। Viral Encephalitis, Meningitis, Secondary bacterial infection—যেমন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, নেফ্রাইটিস, সাইনুসাইটিস, আর্থাইটিস ইত্যাদি জটিল অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। সে ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা উপযুক্ত নার্সিংহোমে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ভর্তি রেখে চিকিৎসা-পরিষেবা দিতে হয়। তবেই এ'রকম আপৎকালীন অবস্থা সামাল দেওয়া সম্ভব।

প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক-ঠাক থাকলে শিশুসহ সকল রোগীকেই অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ করে তোলা যায়। তবে বাড়িতে একজনের ভাইরাসঘটিত সর্দি-কাশি, জ্বরের সমস্যা তৈরি হলে দেখা যায়—অন্যেরা কম-বেশি আক্রান্ত হন। এই ধরনের হাঁচি-কাশি-জ্বর শ্বাসনালীর সংক্রমণ থেকে হয় এবং তা একজন থেকে অন্যজনে হাঁচি কাশি নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। একে droplet infection বলে। অতএব কাশি-হাঁচির সময় রুমাল বা পরিচ্ছন্ন শাড়ির আঁচল ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কাশি থেকে উদ্গত শ্লেষ্মা যেখানে-সেখানে না ফেলে বাথরুমের স্যানিটারি-প্যান, কমোড—এরকম বদ্ধস্থানে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দিতে হয়। গ্রামাঞ্চলে যেখানে এই সুবিধে নেই সেখানে কফ-থুতু একটি পাত্রে জমিয়ে রেখে (ঢাকা দেওয়া) পরে মাটিতে গর্ত করে ফেলে চাপা দিতে বলা হয়। রাস্তা-ঘাটে কফ, থুথু ইত্যাদি ফেললে সেগুলো শুকিয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে হাওয়ার মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির নাকের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে শ্বাসনালীর সংক্রমণ ঘটাতে বেশিক্ষণ সময় নেয় না।

শিশুদের স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে তিন থেকে পাঁচ দিন বাড়িতে বিশ্রামে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়। বড়রাও যতটা সম্ভব ঘরে বিশ্রাম নিন এবং তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। অসুস্থ অবস্থায় সংক্রমণ সঙ্গে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে গেলে কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয় না, বরঞ্চ সুস্থ হওয়ার জন্য অনাবশ্যক বেশি সময় লেগে যায়। অতএব স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারি প্রভৃতি জনবহুল স্থানে অসুস্থ শরীরকে টেনে নিয়ে গিয়ে কাজ করালে নিজে যেমন ক্রমাগত আরও কাবু হয়ে পড়বেন তেমনি পরিবেশে জীবাণু ছড়িয়ে দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে ও অজ্ঞতায় সহপাঠী ও সহকর্মীদেরকেও অসুস্থতার শিকার করে ফেলবেন না যেন।

সেই কালো টাকা

—দুয়ের পাতার পর

কালো টাকার কেচ্ছা

সেই ১৯৯৫ সালের ৪ মার্চ সি বি আই(CBI), ফেরা(FERA) এবং ফেমা(FEMA) আইন লঙ্ঘন করার জন্য এফ আই আর করে শিল্পপতি এস কে জৈন এবং তার কর্মচারী জে কে জৈনের বিরুদ্ধে। জৈনের হাতের লেখা এক নথি থেকে জানা যায় ১৯৮৫-১৯৯১ পর্যন্ত, এই ৬ বছরে ৬৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা সে খরচ করেছে। নানা তথ্যে প্রমাণিত হয়, জৈনরা বিভিন্ন দেশে হাওলার মাধ্যমে টাকা পাঠাত। এই মামলা জৈন হাওলা মামলা বলে বিখ্যাত হয়ে আছে। ২০১২ সালের ২ মে পর্যন্ত ওই মামলা চলে এবং জৈনের কাছ থেকে বিদেশি অর্থ উদ্ধার হয়। জৈনরা তখন ই ডি-র বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনে। জৈন হাওলা মামলায় আদবানীসহ অনেকের নাম জড়িয়ে যায়।

হাসান আলি খান এবং কাশীনাথ তাপুরিয়ার বিরুদ্ধেও হিসাব বহির্ভূত অর্থ রাখার অভিযোগ ওঠে। হাসান আলি খান পুনের ব্যবসায়ী হলেও কাশীনাথ তাপুরিয়া আমাদের কলকাতার কারবারি। হাসান আলির পুনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪.০৪ বিলিয়ন ডলার সঞ্চয়ের নথি পাওয়া যায়। তারা এখন জেলে।

এসব তো হিমশৈলের চূড়ো, কোটি কোটি কালো টাকা বিভিন্ন ভাবে দেশে এবং দেশের বাইরে রয়ে গেছে। একটা সমান্তরাল অর্থনীতি চলছে যেন।

কালো টাকার কাহিনি

২০১০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'বিশ্ব ব্যাঙ্ক'-এর 'দারিদ্র্য এবং অসাম্য' বিষয়ক একটি গবেষক দল ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার ১৬২টি দেশের 'ছায়া অর্থনীতি' বা 'স্যাডো ইকনমিকস' বিষয়ে সমীক্ষা চালায়। তারা ওই দেশগুলির অর্থনীতিতে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৭ অর্থাৎ মোট আট বছরের একটা হিসাব তৈরির চেষ্টা করে। দেখা যায় যে, 'ছায়া অর্থনীতির' প্রভাব সেইসব দেশের গড় জাতীয় আয়ের ১৯৯৯ সালে যেখানে ছিল ৩৪ শতাংশ সেখানে ২০০৭ সালে হয়েছিল ৩১ শতাংশ।। ভারতে এটা ছিল যথাক্রমে ২০.৭ এবং ২৩.২ শতাংশ। অর্থাৎ অন্য দেশে যখন কমেছে কালো টাকার প্রভাব তখনো আমাদের দেশে তা বেড়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে লুকানো এই টাকা নানা কারণে তৈরি হয়ে সাদা টাকার কারবারিদের বিপদে ফেলে।

কর(Tax) ফাঁকি দেওয়া, সামাজিক দায়িত্ব ফাঁকি দেওয়া, শ্রমবাজারে নানারকম কারচুপি, (যেমন, ন্যূনতম মজুরি না দেওয়া, শ্রমের ঘন্টা বাড়ানো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কমানো ইত্যাদি) প্রশাসনকে ভুল/মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে এই কালো টাকা জন্মায় এবং বাড়ে। অধ্যাপক অরুণ কুমারের মতে আমাদের 'গড় জাতীয় আয়'-এর ৫০ শতাংশই কালো টাকার কেরামতিতে। এই টাকার হিসাব বের করা খুবই মুশকিল বলেও তিনি মনে করেন। (EPW, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ২১) ১৯৪৭ সাল থেকে ৪০টি কমিশন এবং কমিটি গঠন করা হয়েছে এ ব্যাপারে কিন্তু কাজের কাজ এই ৬৭ বছরে কিছু হয়েছে বলে মনে হয় কি?

নীতিনির্ধারক (রাজনীতিবিদ), ব্যবসায়ী এবং প্রশাসক এই তিনের সমন্বয়ে গঠিত অশুভ আঁতাতেই জন্ম এই কালো আয়ের। এই ত্রয়ীর আবার ডালপালা আছে। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসক আমলাতন্ত্রকে, পুলিশ এমনকি বিচারব্যবস্থাকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। এভাবেই কালো টাকার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। শুধু কর ফাঁকি, ঘুষ নয়, ড্রাগ ও অন্যান্য বে-আইনি পাচারে, (এমন কি অস্ত্র, শিশু ও নারী পাচারের) মাধ্যমেও কালো টাকার জন্ম হয়। অর্থাৎ সবটাই দুর্নীতি ও অপরাধ থেকে।

কা কস্য পরিবেদনা

আমাদের দেশে এইসব অপরাধ ও দুর্নীতি ধরার জন্য এত আইন ও তার প্রয়োগের সংস্থা আছে যে, সবগুলি শুনলে যে কোনো পাঠকের হাসি পাবে। ধরুন, এখন বাজারে /মিডিয়ায় যা খুব খাচ্ছে, সেই ই ডি (এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট), সি বি আই, আই বি (ইনটেলিজেন্স ব্যুরো), (রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস উইং (RAW) এবং সর্বশেষে, আর টি আই (রাইট টু ইনফর্মেশন) সবাই আছে, আবার পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি এবং তার গর্ভজাত কালো টাকাও আছে। আমাদের প্রশ্ন, এতসব আইন ও প্রয়োগকারী সংস্থা থাকা সত্ত্বেও এমন হয় কী করে? আর কত আইন করলে এসব রোধ হবে। অধুনা সুপ্রীমকোর্ট গঠিত সিট (SIT —স্পেশাল ইনভেটিসেটিভ টিম)-এর কাজই শুধু দেখবো? বাকিদের ভূমিকা?

কেলোর কীর্তি

শীর্ষ আদালত-গঠিত এই যে 'সিট' তার চেয়ারম্যান হয়েছেন বিচারপতি এম বি শাহ। ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন অরিজিৎ পাসাওয়াত। এক্স-অফিসিও সদস্যরা হলেন, দেশের রেভিনিউ সেক্রেটারি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গর্ভনর, সি বি আই-এর ডাইরেক্টর, ই ডি-র ডাইরেক্টর, নার্কোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর ডিজি, রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স-এর ডিজি, সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং 'র'-এর ডাইরেক্টর। এইসব বাঘা বাঘা পদাধিকারীদের নিয়ে গঠিত 'সিট' কী অশ্বডিম্ব প্রসব করে তা দেখার অপেক্ষায় আমরা আছি। তবে, গত ২ জুনের এক সভায় মিলিত হয়ে এনারা মজবুত সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি নিয়েছেন। তার কিছু কিছু আমরা হাতে পেতে শুরু করেছি। এখন কোর্টের ধমক খেয়ে মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রক বিদেশি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টধারীদের নাম বন্ধ খামে ভরে দিচ্ছে সিটের কাছে। 'সিট' তা খুলে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার অপেক্ষায়।

সুপ্রিমকোর্ট, 'সিট', কেন্দ্রীয় সরকার, সবার সমান প্রচেষ্টা থাকলে তবে তো ফল পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে প্রশ্ন উঠছে যে তীব্র খরসান ধারালো কণ্ঠে মোদি তখন কালো টাকা দেশে আনব বলে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন। এখন কণ্ঠের সেই বাঘের ভেপু বিড়ালের 'মিঁয়াও' এ পরিণত হয়েছে।

কালো, তা সে যতই কালো হোক

এই যে কালো টাকা নিয়ে এত হম্বিতম্বি, সেই কালো টাকা ব্যবহারে কিন্তু ক্ষান্তি নেই কারো। এমনকি বিজেপির মতো ধোয়া তুলসিপাতা দলেরও! হিসাব বহির্ভূত বিদেশি ব্যাঙ্কের টাকায় তারা নির্বাচন করিয়েছে বলে অভিযোগ এবং তার প্রমাণ আছে। লালকৃষ্ণ আদবানী তো জৈন হাওলার সময় কবুল করেছিলেন, তিনি দলের প্রয়োজনে টাকা নিয়েছেন। ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৮২ টি আসন পেতে তাদের দলকে এ বছরের (২০১৪) নির্বাচনেও কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। তার সবটাই সাদামাঠা পথে আসা সাদা টাকা নয়।

'ফর্বস এশিয়া' পত্রিকার সংবাদ অনুসারে গুজরাট সরকার ৭,৩৫০ হেক্টর জমি উপকূল অঞ্চলে আদানি গ্রুপকে দিয়েছে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। সেখান থেকে মোদিজীর যে 'ডিল' হয়েছিল তা প্রকাশিত হয়েছে 'ফ্রন্টলাইন' পত্রিকার ২৭ জুন, ২০১৪ সংখ্যায়। লেখাটির শিরোনাম 'বের করা অর্থে কার ভয়?' বিজেপির ভয় ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে বলেই কোটি কোটি টাকার মধ্যে কয়েকজনের অ্যাকাউন্ট / তথ্য তারা সুপ্রিমকোর্ট মারফৎ সিটকে দিতে পেরেছে। গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী (সূত্র : ঐ) ভারতের ১.২৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কালো টাকা দেশেই আছে, আর বাইরে আছে ১৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯১ সালের উদারীকরণের পর বেসরকারিকরণের হিড়িকে এটা আরো বেড়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারও সেই উদারনীতির পথের পথিক, তাই কালো টাকা তা যতই কালো হোক, তাদের নেতাদের দরকার কালো যদি মন্দ এত কেশ পাকিলে কান্দো কেন?

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মোদি সরকার ৬২৭ জনের নামের তালিকা মুখবন্ধ খামে সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছে। নভেম্বরের শেষে তাদের স্টেটাস রিপোর্ট বা পরিস্থিতি জানাতে হবে; আর আগামী বছরের মার্চের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেবে 'সিট'।

সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা, জুরিখ প্রভৃতি শহরের ব্যাঙ্কগুলিতে যে টাকা আছে তাদের মালিকদের মাত্র কয়েকজনের নাম অ্যাটার্নি জেনারেল মুকুল রোহতগি তুলে দেন। দেখা যাচ্ছে, ২০০৬ সালের পর থেকে সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখার প্রবণতা কমেছে। জেনিভার এইচ এস বি সি ব্যাঙ্ক থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

কালো টাকা বিষয়ে রীতিমতো আন্তর্জাতিক আইন আছে। সেইসব আইন পেরিয়ে টাকার নাগাল পাওয়া সত্যই দুষ্কর। তবু যদি মোদি পারেন, তো ভালই। সি পি আই(এম)-এর পলিটব্যুরো সুপ্রিম কোর্টের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। কংগ্রেস বলেছে, ভোটের সময় বিজেপি প্রচার করেছিল ৫৫, ০০০ কালো টাকার অ্যাকাউন্ট আছে। এখন পাঁচ মাস কেন ৫৫ টি নামও প্রকাশ করতে পারলো না?

সব মিলিয়ে একটা ব্যাপার চলছে! মান্না দে'র গানের কলির অনুসরণে— আশায় আশায় তাই এই আমাদের থাকা, যদি আসে কোনদিন সেই কালো টাকা!

উচ্ছেদের আশঙ্কায় ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩০ অক্টোবর : মেমারি বামুনপাড়া ছানাপট্টি এলাকায় ৩০ বছর ধরে দখলকারি ২২ জন গরিব ছোট ব্যাবসাদার উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কায় বিক্ষোভ শুরু করেন। ব্যাবসাদারদের জায়গার মালিক সমেশ্বর দেবনাথ-এর ২২টা ব্যাবসার দোকানঘর ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে মেমারির একদল ব্যবসায়ীর পরিবার রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান। এর মধ্যে বেশির ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। ২২ জন ব্যাবসাদারদের মধ্যে ২ জন ব্যাবসাদার সেখ নুরুল ইসলাম ও অশোক কর্মকার জানালেন, ২১টা দোকানের জায়গার পরিমাণ ৭ শতক। কিন্তু কাগজে কলমে দেখা যাচ্ছে পয়েন্ট ৭ শতক অর্থাৎ ১০/১২ ফুটের একটি ঘরে বড় মাপের জায়গা। দোকানদারদের হুমকি দিয়ে সব জায়গাটা দখল করার মতলব রয়েছে মালিকের। সেখ সইদুল ও তাপস কুমার পাল দুঃখ করে বললেন, ব্যাবসা চলে গেলে পরিবার, ছেলে মেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে। এই বিক্ষোভের পিছনে এলাকার মানুষেরও সমর্থন রয়েছে।

খাগড়াগড় এবং ...

—প্রথম পাতার পর

নিরাকারবাদী। তারাপীঠের মন্দিরে পুজো-আরতি করে, চরণামৃত পান করে, সন্ধ্যায় মাথায় হিজাব (আবরণ) দিয়ে, 'সেজদা' দিয়ে ইফতারে বসায় রাজনীতি থাকতে পারে, সেকুলারইজম থাকে না। যাঁরা এসব করেন, তাঁরা ধর্মও বোঝেন না, সেকুলারইজমও বোঝেন না। চেষ্টা করলে ধর্মে এবং জিরাফে থাকা যায়। কিন্তু একসঙ্গে আকারে-নিরাকারে থাকা সহজ নয়। কেউ থাকেন না তা নয়। যাঁরা আকার-নিরাকারের 'সংশয়ে' থেকে একটা উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারেন তাঁরা মহোত্তম। যেমন লালন। 'আকারে সৃজন করলে ত্রিভুবন / নিরাকারে চমৎকার ভাব দেখালে'। একবার বলবো, সর্বধর্ম পরিত্যাজং মামেকং শরণং ব্রজ, আর একবার বলবো 'লা ইলাহা ইল্লালাহ মহম্মদ রসুলুল্লাহ'— ব্যাখ্যাটায় অত সহজিয়া নেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত একবার বলেছিলেন, তিনি কোরাণ পড়েছেন এবং নিয়মিত নামাজও পড়েন। এ দাবি কতটা সত্য, তার চেয়েও বড় কথা এ উক্তি ধর্মানুরাগের নয়, ধর্মের নামে ভোটের রাজনীতির ফসল তোলার কৌশল মাত্র।

ভোট বড়ো বালাই। ভারত এখন দেশ নয়। রাষ্ট্র। দেশে মানুষ থাকে। রাষ্ট্রে থাকে ভোটার। সেই ভোটারই রাষ্ট্রশক্তির উৎস মুখ। কোন ভোটার কোন ফুলে তুষ্ট, রাষ্ট্রকে ভাবতে হয়। কুরুক্ষেত্রে একবার যুদ্ধ হয়েছিলো। যুদ্ধ শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, এখন তুমি রাজশক্তি। সকলেই তোমার প্রজা। আর সামনে তোমার দেশ। আর তোমার শত্রু নেই। নেতাদের সামনে রাষ্ট্র। সংবিধান, আই পি সি তারকাঁটা। প্রতি পাঁচবছরে গড়ে চারটি যুদ্ধ। লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, তারপর স্কুলকমিটি, সমবায়, থানাকমিটি তো আছেই। যত যুদ্ধ, তত শত্রু। আমার ভোটার আমার ভোটার। অতএব যুক্তিহীন নীতিহীন তোষণ।

আমি মাদ্রাসা বন্ধ করার ঘোর বিরোধী। মাদ্রাসার লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজ ইতিহাস জ্ঞানবিজ্ঞানের পাশাপাশি আরবি-ফার্সি শিখতে হবে। প্রশ্ন হল, সংস্কৃত-আরবির মতো তৃতীয় ভাষার প্রয়োজন কতখানি? সংস্কৃতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী শাস্ত্র রচিত হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় বহু ভাষা, বিশেষত দক্ষিণভারতীয় ভাষা সংস্কৃত অনুগামী। তাই সংস্কৃত শেখার প্রয়োজন আছে। আরবি শিক্ষার প্রয়োজন আরও বেশি। আরও ব্যবহারিক। প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্য সহ বহু রাষ্ট্রে একটু কারিগরি কাজ আর আরবি ভাষা জানলে চাকরি পাওয়া যায়। খুব বড়ো কাজ না হলেও উপার্জন মন্দ হয় না। মনে আছে, ঢাকা বিমানবন্দরে একজন মানুষকে দেখেছিলাম অভিবাসন কর্তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করছেন। পরে জানলাম, ইনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন জেড্ডায়। তাঁর কথায়, 'আমরা মিডল ইস্ট থেকে ট্যাহা পাঠই বইল্যা, ত'গো দ্যাশটা চলে। কী নিমর্ম এবং কতো সত্য! আমি এই ধরনের অজস্র কর্মী দেখেছি থাইল্যাণ্ডে, মালয়েশিয়ায়, দুবাই-এ, বাংলাদেশে, এমনকী ইংল্যাণ্ডে। এদের মতো মানুষদের জীবিকার জন্য আরবি জানা খুব প্রয়োজন। এ রাজ্যে চাকরির কী অবস্থা আমাকে বলতে হবে না। সবাই জানেন। পেটের জন্য কাজ তো দরকার। অথবা যৌবনেই সকল মুকুল ঝরিয়া যায়। সামান্য সিভিক পুলিস(?) ভলান্টিয়ার। কী ত্রিশঙ্কু অবস্থা এই ছেলেগুলোর! দ্বিতীয়ত, অনেকে ভাবে আরবি জানলে একটা ইমামতি জুটতে পারে। নিদেন মোয়াজেম। ভাত কাপড়ের অভাব অন্তত হবে না। তৃতীয়ত, একদল আছেন যাঁরা আন্তরিকভাবে ইসলামের রূপরেখা, কর্তব্য ও ইতিহাস জানতে চান। আমপারা হাফেজ ক্বারি মৌলনা মুফতি আলেম-উলেমা নয়—নিজেরাই গভীরে ঢুকতে চান। সৈয়দ আবদুল হালিম একজন প্রাজ্ঞ সুলেখক। আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'আমি ইসলামে বিশ্বাস করি। আমি সন্ত্রাসকে ঘৃণা করি। তার একটাই কারণ—আমি আল্ কুর-আন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। কুর-আনের এবং ইসলামের মূল বার্তাই হল 'সলম' অর্থাৎ শান্তি। অর্ধশিক্ষিতদের মুখে শুনে কুর-আন বুঝতে গেলে তা বোঝা হয়ে যায়।'

দুর্ভাগ্যক্রমে খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণের পিছনে যারা ছিলো এবং আছে, তারা সকলেই মুসলমান এবং মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত। এতএব সরল সমীকরণ, লজিক্যালি সকল মুসলমান মাদ্রাসার সাথে যুক্ত এবং বিস্ফোরণ ঘটায়। এই যুক্তি একেবারেই ধোপে টেকে না। এক লক্ষ মুসলমানের মধ্যে একজন সন্ত্রাসকে সমর্থন করেন কিনা সন্দেহ। উচ্চাবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ছা-পোষা মুসলমানের মধ্যে একজনও নেই—যিনি সন্ত্রাসকে সমর্থন করেন। দারিদ্র্য কিছু মানুষকে সমাজবিমুখ করে তোলে। একদিকে এই 'তৃষিত মরু'তে অভাব অন্নহীনতা বেকারত্ব বঞ্চনা আর অন্যদিকে 'রসালনন্দন' জান্নাতের স্বপ্ন—দুই-এর মধ্যে থেকে ব্যবস্থাকে প্রতিপক্ষ মনে করে। তার কাছে হিজাব-পরিহিতা ব্রাহ্মণকন্যার স্তোক ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নির্জলা হয়ে দেখা দেয়। যে তাস নিয়ে সাম্প্রদায়িক খেলা খেলে সরকার, সেই তাসেই সন্ত্রাসীরা বাজিমাত করে। যেমন লাদেনকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বানিয়েছিলো আমেরিকা। তার হাতেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়লো ইমারত। সন্ত্রাসের তাস যখন তখন ত্রাস হয়ে যাবে। সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম নেই। দেশ কাল নেই।

বর্ধমান শহরে কয়েকটি পাড়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাধিক্য। এর মধ্যে বনেদি অভিজাত এবং অবস্থাপন্ন পল্লিগুলি নিয়ে সন্দেহের অবকাশও নেই। খাগড়াগড়, বাবুরবাগ ইত্যাদি এলাকাগুলিও আপাত শান্ত। বাবুরবাগ এলাকার বসবাস এবং চাকুরি নিয়ে সাড়ে তিন দশক কেটেছে। কোনোদিনই উগ্রতা দেখিনি। এর চারপাশে গোলাপবাগ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-বিভাগ), মেডিক্যাল কলেজ, রাজকলেজ ইত্যাদি। দূরশিক্ষার বহু ছাত্র-ছাত্রী এইসব এলাকায় মেস করে থাকে। বাড়িওয়ালাদের এটি একটি জমাট ব্যবসা। প্রচুর হিন্দু বাড়িতেও মেসবাড়ি আছে। এরা অস্থায়ী বাসিন্দা। এক / দেড় বছর থাকে। ভাড়াটে-সুমারি করা সহজ কাজ নয়। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে নিয়ে সমস্যা নয়। সমস্যা যে সব ক্ষেত্রে, সেগুলি হল,ভাড়াটের গতিবিধি যদি সামান্য সন্দেহের উদ্রেক করে সেক্ষেত্রে পুলিশকে জানানো উচিৎ। খাগড়গড়ে অবাঞ্ছিত উপস্থিতি জানানো যেতে পারতো। অস্বাভাবিক বিদ্যুৎবিলও সন্দেহের উদ্রেক করে।

তবে সব কিছুর আগে প্রয়োজন বর্ধমানে সম্প্রীতির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনা। ঘোলা জলে মাছ ধরলে হবে না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। আজ এ দল মিছিল করছে, আর একদল কার্জনগেটের জমায়েত মঞ্চ থেকে হুঙ্কার দিচ্ছে। হুঙ্কারে কিছু হয় না। বুশ পারেননি, ওবামা পারেননি। সৌহার্দ্যের প্রাক্‌শর্ত হুঙ্কার নয়, তোষণও নয়। উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের সমাজ থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। সন্ত্রাসীর কোনো জাত নেই। ধর্মও নেই। এদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে এক পক্ষকাল লাগালে মানবতার অসম্মান করা হবে। দয়া করে ভোটের অঙ্ক নিয়ে বসবেন না। ভাতাপ্রাপ্ত ইমাম মসজিদে বলবেন অমুককে ভোট দাও, আর সব মুসলমান দলবদ্ধভাবে তাকে ভোট দেবে—এই তত্ত্ব ভুল। এই তত্ত্বে মুসলমানদের আত্মমর্যাদাকে অসম্মান করা হয়। আর পাঁচজন নাগরিকের মতোই, সচেতন ভোটারের মতো প্রত্যেকে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করেন ভোটবাক্সে।

ভণ্ডামি ছেড়ে পথে নামলে দেখা যাবে বিসমিল্লা খান আজও সানাই বাজাচ্ছেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। রাগ দেশ-কল্যাণ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ২৯ অক্টোবর; ২। ১৭৮৫ সালের ২৯ অক্টোবর, মৃত্যু ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২১; ৩। মার্গারেট এলিজাবেথ, আয়ারল্যাণ্ডে, ২৮ অক্টোবর, ১৮৬৭, মৃত্যু দার্জিলিং-এ ১০ অক্টোবর ১৯১১; ৪। বর্ধমান জেলার বেরুগ্রামে ২৯ অক্টোবর, ১৮৫৩, মৃত্যু ১ জানুয়ারি ১৯৩৯; ৫। আলবেয়ার কালমেত্তে, কামিল্লে গুরিণ, মৃত্যু ২৯ অক্টোবর ১৯৩৩; ৬। ১৯৪৫ সালের ২৯ অক্টোবর, লন্ডনে, ৬০টি দেশের ৪৩৭ জন প্রতিনিধি ও ১৪৮ জন দর্শক; ৭। ১৮২১ সালের ৩০ অক্টোবর, মৃত্যু ২৮ জানুয়ারি ১৮৮১; ৮। ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর, মৃত্যু ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩; ৯। ১৮৮৭ সালের ৩১ অক্টোবর, মৃত্যু ৫ এপ্রিল ১৯৭৫; ১০। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর, দেহরক্ষীর দ্বারা; ১১। ২০১১ সালের ৩১ অক্টোবর; ১২। ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর।

By Courtsy

S. K. Banerjee

Burdwan

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি মৃত্যুঞ্জয় দফাদার, পিতা - রবীন্দ্রনাথ দফাদার, গ্রাম - তেলিপাড়া, পোঃ - গুপ্তিপাড়া, জেলা - হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কালনার নিকট ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার নাম মারিয়া দফাদার যা জন্মশংসাপত্রে নথিভুক্ত আছে। আমি আমার কন্যার নাম 'মারিয়া দফাদার'-এর পরিবর্তে 'রিয়া দফাদার' রাখতে চাই। মারিয়া দফাদার, পিতা - মৃত্যুঞ্জয়া দফাদার ও রিয়া দফাদার, পিতা মৃত্যুঞ্জয় দফাদার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মফিকুর রহমান মল্লিক, পিতা - কেরামত আলি মল্লিক, গ্রাম - বোচপুর, পূর্বস্থলী, বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ইউসুফ মল্লিক কিন্তু জন্মশংসাপত্রে তা ভুলবশত মহম্মদ ইউসুফ রহমান মল্লিক নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র ইউসুফ মল্লিক নামে সর্বত্র পরিচিত হল।

● আমি দীপঙ্কর সুর, পিতা - লক্ষ্মী নারায়ণ সুর, বড়নীলপুর, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৮ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম রিয়া সুর, যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত দেবোলিনা সুর নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার কন্যা রিয়া সুর নামে সর্বত্র পরিচিত হল। রিয়া সুর ও দেবোলিনা সুর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি রাধাকান্ত রায়, পিতা - তারাপদ রায়, গ্রাম -সেহারা গ্রাম, পোঃ - সেহারা, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৯ মার্চ, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম হল রাধাকান্ত রায়, কিন্তু ভোটার পরিচয়পত্রে তা ভুলবশত রাধাকান্ত বসু, পিতা - তারাপদ বসু নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, রাধাকান্ত রায়, পিতা - তারাপদ রায় ও রাধাকান্ত বসু, পিতা - তারাপদ বসু এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি রতন ক্ষেত্রপাল, পিতা - প্রয়াত পার্বতী ক্ষেত্রপাল, গ্রাম - গোতান, দত্তপাড়া, থানা - মাধবডিহি বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩১ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম রতন ক্ষেত্রপাল, যা ভোটার পরিচয়পত্রে সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয়েছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত রতন বাউরী নথিভুক্ত হয়েছে। রতন ক্ষেত্রপাল ও রতন বাউরী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সোনা সরকার (সাহা), পিতা - উপেন্দ্র সরকার, ছোটনীলপুর, আমবাগান, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩১ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার মা মায়ারানি সরকার ১৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে নিজ বাসভবনেই প্রয়াত হয়েছেন। আমার প্রকৃত নাম সোনা সরকার যা আমার মা-এর রেশনকার্ড(বি পি এল)-এ সোনা সরকার (সাহা)-এর পরিবর্তে সোমা সরকার নথিভুক্ত হয়েছে। সোনা সরকার (সাহা) এবং সোমা সরকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● *I, Ramani Kanta Barui, S/o- Lt. Ruidas Barui, Narayan Dighi (Rayan Road), Burdwan by an affidavit before the Executive Magistrate, Burdwan on 31 October, 2014 hereby declare that my actual name is Ramani Kanta Barui, S/o- Lt. Ruidas Barui but in a registered deed wrongly recorded as Ramanikanta Barai, S/o - Ruhidas Barai. Ramani Kanta Barui, S/o - Ruidas Barui, Ramanikanta Barai, S/o- Ruhidas Barai is one and same identical person.*

বিজ্ঞাপন

বর্ধমান স্টেশনের উত্তর দিকে মিনিট পাঁচেক হাঁটা পথ, চার নং ওয়ার্ডের সাধনপুর মৌজার অন্তর্গত এক লপ্তে বিয়াল্লিশ শতক জায়গা, এ্যাসবেস্টাস ছাউনি, কলের জল, ইলেকট্রিসিটি (প্রায় চল্লিশ কিলোওয়াট) ফোন সমেত যেখানে যা আছে সেই অবস্থাতেই বিক্রি। যোগাযোগ করুন— **৯৪৩৪০২১১২৬** নম্বরে। সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বৈকাল ৫টা থেকে ৭টার মধ্যে।

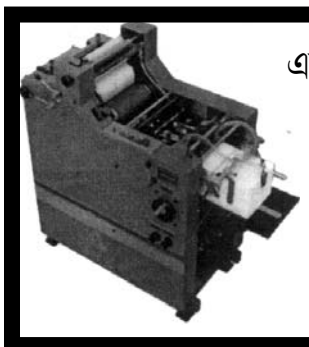

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

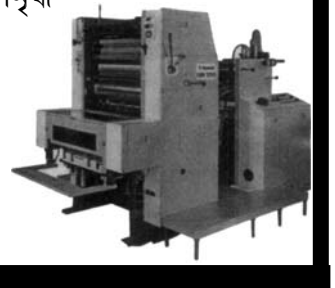

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা